হাসিনা-ইনকিলাব সংলাপ ॥ তারপর?

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

একটা খবর পড়েছি কয়েকদিন আগের ঢাকার কাগজে। দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক বাহাউদ্দীন গিয়েছিলেন শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনে। এক ঘণ্টা তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে। খবরটা পড়তে গিয়ে মনে পড়েছে এই সেই বাহাউদ্দীন, যিনি শুধু একাত্তরের ঘাতক ও রাজাকার সদ্য মৃত ময়লানা মান্নানের ছেলে নন, বাপের সবরকম কুকর্মের সঙ্গী ছিলেন এবং ইনকিলাবসহ সেসব কুকর্ম থেকে প্রাপ্ত সবকিছুর একজন উত্তরাধিকারীও। এই সেই বাহাউদ্দীন, যিনি ইনকিলাবের জন্ম থেকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার মূল ভিত্তিগুলোর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতামূলক অপপ্রচার চালিয়েছেন। বিএনপি-জামায়াত জোটকে সমর্থন দানই ছিল যার একমাত্র নীতি। জাতীয় সঙ্গীতের অশ্লীল প্যারোডি নিজের পত্রিকায় ছেপে যে বাহাউদ্দীন তার কয়েকজন সঙ্গী সাথীসহ দেশদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে হাইকোর্টের এক বিচারপতির দ্বারা মধ্যরাতে এজলাস বসিয়ে জামিন নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই বাহাউদ্দীন এবং ইনকিলাব পত্রিকা এখন ঘোর সরকারবিরোধী। আরও স্পষ্ট ভাষায় জামায়াত-বিরোধী। মাদ্রাসা ফান্ডের বিপুল অর্থের মালিকানা নিয়েই জামায়াত ও বাহাউদ্দীনের বিরোধের উৎপত্তি। মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির কর্তৃত্ব দখল করতে গিয়ে জামায়াতপন্থীরা বাহাউদ্দীনকে মারধরও করেছে। বাহাউদ্দীন তাই তার ইনকিলাব পত্রিকা নিয়ে আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকেছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের সঙ্গে তার হবনব আগে থেকেই ছিল। এখন বাহাউদ্দীনের জন্য সুধা সদনের দরোজা খুলে গেছে। বাহাউদ্দীন বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান। জামায়াতও তা জানে। তাই ইনকিলাবের সমর্থন হারিয়ে তারা 'নয়া দিগন্ত' নামে নিজেদের দলীয় পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

বাজারে গুজব, বাহাউদ্দীন আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের অনেকেই নাকি তার প্রতি সহানুভূতিশীল। আরও একটি খবর পড়েছি ঢাকার কাগজেই। আওয়ামী লীগ নেত্রীর প্রচ্ছন্ন মদদে চরমোনাইয়ের পীর, তরিকত ফেডারেশনের নজিবল হক মাইজভান্ডারী এবং আরও দু'একজনকে নিয়ে একটি ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করা হচ্ছে। তারা বিএনপি-জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেবে।

হাসিনা-বাহাউদ্দীন মোলাকাতের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকার কোনো কোনো কাগজে ইতিমধ্যে তার সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কারের প্রশ্নে সরকারী দলের সাথে প্রস্তাবিত সংলাপে বসতে জামায়াতের প্রতিনিধি থাকলে আওয়ামী লীগ রাজি নয়, সেখানে জামায়াতের মতোই ঘাতক ও রাজাকার চরিত্রের ইনকিলাব গোষ্ঠীর বাহাউদ্দীনের সঙ্গে শেখ হাসিনা কি করে বৈঠকে বসতে রাজি হন অথবা বসেন? এই প্রশ্নের জবাব আওয়ামী লীগ কিভাবে দেবে অথবা আদৌ দিতে চায় কিনা জানি না।

আমরা যারা আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং শেখ হাসিনাকে আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চাই তারা আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এবং শেখ হাসিনার কোনো কোনো কার্যকলাপে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়ে যাই। এসব কার্যকলাপকে সমর্থন করার কোনো যুক্তি বুদ্ধি খুঁজে পাই না। একটা যুক্তিই খুঁজে পাই, তা হলো আওয়ামী লীগ নীতিবর্জিত ক্ষমতার রাজনীতিকেই এখন বেশি প্রাধান্য দিতে চায়। এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে এই পন্থায় আওয়ামী লীগ কি সত্যই ভোটে জিতবে, ক্ষমতায় যেতে পারবে? আর পারলেও জন আস্থা ধরে রেখে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি? সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ও সমাজ গঠন কি আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হবে? যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে বর্তমান জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের জন্য নির্যাতিত দেশের মানুষ উৎসাহ ও শক্তি খুঁজে পাবে কোথায়?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতীদের পুনর্বাসনের জন্য আওয়ামী লীগের অবদানও একেবারে কম নয়। আজ যেমন ইনকিলাবের বাহাউদ্দীন এসে সুধা সদনে ঢুকছেন, ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনের আগে তেমনি মতিউর রহমান নিজামী চুপি চুপি আমন্ত্রিত না হয়েও সংসদ ভবনে শেখ হাসিনার প্রেস কনফারেন্সে এসে ঢুকেছিলেন। পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হয়েছিল এবং দেশে শোরগোলও পড়েছিল। শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগের 'সাময়িক কৌশলের রাজনীতি।' আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেদিনও আমরা অনেকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলাম। আওয়ামী লীগ তাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেনি। এই কৌশলের রাজনীতি আওয়ামী লীগকে সাময়িক সাফল্য দিয়েছিল। কিন্তু জামায়াতকে দিয়েছে স্থায়ী সাফল্য।

আওয়ামী লীগের কাঁধে চেপেই জামায়াত এবং একাত্তরের ঘাতকেরা দেশের রাজনীতিতে তাদের অস্পৃশ্যতা ঘুচিয়েছে এবং বিএনপির সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রী বন্ধন বেঁধে ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হয়ে বসার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই চেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে মৌলবাদী সন্ত্রাসকে উস্কে দিচ্ছে। এই সহজ সত্যটির দিকে আওয়ামী লীগ নেতারা, এমনকি চৌদ্দ দলের অনেক প্রধান নেতাও চোখ ফেরাতে চাননি। তারা মতিউর রহমান নিজামীর মতো একাত্তরের এক ঘাতকের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক মেলামেশা, ইফতার পার্টিতে পাশে বসা, করমর্দন ও বুকে বুক মেলাতেও কোনো দ্বিধা বোধ করেননি। এখন ক্ষমতায় বসা জামায়াতকে দেখে তাদের হয়তো চৈতন্যোদয় হয়েছে। হয়তো বুঝতে পারছেন, রজ্জুভ্রমে এক বিষধর সাপকে তারা দেশের রাজনীতিতে মাথা তুলতে দিয়েছেন। এই বিলম্বিত চৈতন্যোদয় থেকেই কি তারা এখন গো ধরেছেন জামায়াতের সঙ্গে সংলাপে বসবেন না?

যদি তাই হবে, তাহলে জামায়াতীদের মতোই দেশদ্রোহী, একাত্তরের ঘাতক ও কোলাবরেটর ইনকিলাব গোষ্ঠীর বাহাউদ্দীনদের জন্য সুধা সদনের দরোজা খুলে যায় কি করে? ছিয়ানব্বই সালে জামায়াতীরা যেমন নীতি বদল করেনি, কৌশল বদল করেছিল, ২০০৬ সালে আরেকটি নির্বাচনের আগে ইনকিলাবীরা তেমনি নীতি বদল করেনি, কৌশল বদল করেছে মাত্র। কৌশলটি হলো, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংঘাতের দরুন জামায়াতকে কোণঠাসা করা এবং তাদের স্থানটি দখল করা এবং সেজন্যে ভোল পাল্টে আওয়ামী লীগের সমর্থক সেজে দলটির সাহায্য গ্রহণ করা। উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে ইনকিলাবীরা আবার বিএনপির কাছেই ফিরে যাবে। কারণ বিএনপিই হচ্ছে তাদের ন্যাচারাল এলাই। গত প্রায় তিন দশক ধরে পিতা-পুত্র মান্নান-বাহাউদ্দীনের আসল চেহারা কি আওয়ামী লীগ নেতারা লক্ষ্য করেননি? নেকড়ে তার গায়ের রং রাতারাতি বদলালেই কি তাকে মেষ ভেবে প্রশ্রয় দিতে হবে?

জামায়াতীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি না হয়ে ইনকিলাবীদের সঙ্গে শেখ হাসিনা বৈঠক করায় যারা তার সমালোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে কারও কারও আছে আওয়ামী বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক মতলব। তাদের প্রোপাগান্ডা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। নিরপেক্ষতার দাবিদার যে পত্রিকা গোষ্ঠীর পত্রিকায় এখন হাসিনা-বাহাউদ্দীন বৈঠক সম্পর্কে কটাক্ষ করা হচ্ছে, তাদের এক বকেয়া

বামপন্থী সম্পাদক '৯৫ সালে জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের 'সাময়িক কৌশলের মৈত্রীরও' বহু আগে তার সম্পাদিত দৈনিকে নিজেই গোলাম আযমের এক বিশাল সাক্ষাতকার গ্রহণ করে তা ছেপেছিলেন। তখন একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের বিচার দাবিতে দেশে চলছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বিরাট আন্দোলন। এই সময় কোণঠাসা গোলাম আযমকে উদ্ধার করার জন্য এই সম্পাদক এগিয়ে এসেছিলেন এবং দেশের জাতীয় দৈনিকে গোলাম আযমের পুনর্বাসনের প্রথম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই সম্পাদকের পত্রিকা-গোষ্ঠীর পত্রিকাতেই এখন বাহাউদ্দীনের সঙ্গে হাসিনার বৈঠক সম্পর্কে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

এই ভণ্ডামিপূর্ণ সাংবাদিকতার কথা যাক। যারা দেশপ্রেমিক, সেক্যুলার বাংলাদেশ গড়ার আদর্শে বিশ্বাসী এবং আওয়ামী লীগের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তারাও এখন আওয়ামী লীগ-নেত্রীর বার বার ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে শঙ্কিত। আমি নিজেও ভেবে পাই না। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনা কাদের পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান কলকাঠি নেড়েছেন যিনি, সেই হেনরি কিসিঞ্জার-কমিটির হাত থেকে শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন? তারেক রহমান বা তার প্রতিনিধিকে সুধা সদনে ঢুকতে না দিয়ে সা. কা. চৌধুরীর মতো এক ব্যক্তিকে সেই একই ভবনে ঢুকতে দিয়ে মিষ্টি মুখ করান? এখন ইনকিলাবী দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ওঠাবসাও কি আরেকটি সাময়িক রাজনৈতিক কৌশলের মৈত্রী? প্রশ্ন, এই কৌশল দ্বারা লাভবান হবে কে, আওয়ামী লীগ, না ইনকিলাবীরা?

ইনকিলাবীদের আদর্শ হচ্ছে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র মৌলবাদ। তাদের ন্যাচারাল এলাই জামায়াত ও বিএনপি। বর্তমানের সাময়িক স্বার্থসংঘাত মিটে গেলেই যে তারা ২০০১ সালের জামায়াতীদের মতো পুরনো মিত্রদের কাছে ফিরে যাবে এ সম্পর্কে কারও মনে কি সন্দেহ আছে? ত্রিশ বছরের স্বভাব বদলে ইনকিলাবীরা হবে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমর্থক, একথা কোনো পাগলকেও বিশ্বাস করানো যাবে কি?

আমাকে কেউ কেউ বোঝাতে চেয়েছেন, বিষ দিয়ে বিষ তাড়াতে হয়। জামায়াতীদের মতো ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ও ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মোকাবিলা করার জন্য ইনকিলাবীদের মতো অনুরূপ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাহায্য দরকার। কেউ কেউ বলেছেন, রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু, স্থায়ী মিত্র বলে কেউ নেই, গতকালের শত্রু আজ মিত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং আওয়ামী লীগ তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যদি গতকালের শত্রুকে আজ মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে দোষের কি আছে?

থিয়োরি হিসাবে কথা দু'টি যত সত্য মনে হয়, বাস্তবে সর্বক্ষেত্রে ততটা সত্য নয়।

টাটকা প্রমাণ, ১৯৯৫ সালের আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের 'সাময়িক কৌশলের মৈত্রী।'

বিলেতে নিউ লেবার দলের নেতা টনি ব্লেয়ার নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় তাঁর প্রথম নির্বাচন-বিজয়ের আগে কট্টর টোরি সমর্থক, বর্ণবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল 'সান' পত্রিকায় (টাইমস এবং সানডে টাইমস্-এরও) মালিক রুপার্ট মারডোকের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক এবং খানাপিনা শুরু করেছিলেন। ব্লেয়ারের বন্ধুরা বলেছিলেন এটা ট্যাকটিকাল ফ্রেন্ডশিপ। নির্বাচনে জেতার জন্য প্রভাবশালী ট্যাবলয়েড ডেইলি সানের সমর্থন নিউ লেবারের দরকার। 'সান' সেই সমর্থন দিয়েছে এবং টনি ব্লেয়ারের কাছ থেকে সে জন্যে উচ্চমূল্য আদায় করেছে। ব্লেয়ার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু শয়তানের কাছে আত্মা বন্ধক দিয়ে কার্যত নিউ লেবারকে টোরি দলের চাইতেও কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল দলে পরিণত করেছেন। টোরি দলের প্রত্যেকটি গণ-বিরোধী পলিসি ব্লেয়ার সরকার অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করছে এবং ইরাক যুদ্ধের সময় থেকে পার্লামেন্টে টোরি সদস্যদের ভোটেই ক্ষমতায় টিকে আছে। টোরি দলের কোনো কোনো প্রভাবশালী নেতাই বলেছেন, যতোদিন টনি ব্লেয়ার নিউ লেবার গভরমেন্টের প্রধানমন্ত্রী আছেন, ততোদিন টোরিদের ক্ষমতায় যাওয়ার দরকার নেই।

আসলে মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে টোরি দল দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকে পোল ট্যাক্সসহ বিভিন্ন গণ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করায় এমনভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল যে, নব্বইয়ের গোড়ায় নির্বাচনে জেতা ছিল লেবার দলের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র নেশায় অন্ধ টনি ব্লেয়ার যে কোনো মূল্যে গদিতে বসার জন্য লেবারের ট্রাডিশনাল ভ্যালু ও নীতিগুলোকে বর্জন করেন এবং টোরি পলিসির সঙ্গে আপোস করে ক্ষমতায় বসেন। ফলে টনি ব্লেয়ার এখন ব্রিটেনের সবচাইতে ধিক্কৃত প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর দলের সর্বনাশ করেছেন, এবং গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেনের যে সুনাম ছিল, তাও ধ্বংস করেছেন।

বাংলাদেশে জোট সরকারের অপশাসন এবং রেইন অব টেরর প্রতিষ্ঠাই এই সরকারের পতনের কারণ হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা না থাকলেও দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে হাসিনার জনসমাবেশে এসে ভিড় জমাচ্ছে, তার কারণ খালেদা-নিজামী শাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ অনাস্থা। এই গণঅনাস্থাকে আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণ আস্থায় পরিণত করতে পারলে আগামী নির্বাচনে 'শত মেকানিজম' সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দ দলের বিজয় অনিবার্য। এই পথে না এগিয়ে আওয়ামী লীগ দলের ট্রাডিশনাল ভ্যালু এবং সেক্যুলারিজমসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে নীতিহীন ক্ষমতার রাজনীতির পেছনে দৌড়ালে পরিণামে তাদের দারুণ পস্তাতে হবে। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী এইভাবে নীতি আদর্শ ধুলায় ছুড়ে ফেলে ক্ষমতার পেছনে ছুটেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে আপোস করেছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য ক্ষমতাতেও গিয়েছিলেন। তারপর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দ্বারা ব্যবহৃত কলার খোসার মতো আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। মনের দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি বলেছিলেন, আই লস্ট ফেইথ ইন হিউম্যানিটি–আমি মানবতার ওপর আস্থা হারিয়েছি।

আজ যে ইনকিলাবী চক্র এসে সুধা সদনে ধর্ণা দিচ্ছে তাতে তাদের নীতি বদল বা লক্ষ্য বদল হয়েছে কিংবা তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং তার গণতান্ত্রিক অস্তিত্বের মিত্র হয়েছে তাও নয়, এটা ধর্ম ব্যবসায়ী দুই গ্রুপের মধ্যে নির্লজ্জ এবং প্রকাশ্য স্বার্থ সংঘাত। এই সংঘাতে জামায়াতের কাছে পরাজিত ইনকিলাব গ্রুপ আওয়ামী লীগের ছাতার নিচে সাময়িকভাবে এসে অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বার্থ সংঘাতে জয়ী হতে চাইছে। গণশত্রুদের মধ্যে এই বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ আওয়ামী লীগ অবশ্যই নেবে এবং শেখ হাসিনা যদি ম্যাচিউর রাজনৈতিক নেতা হয়ে থাকেন, তাহলে গণশত্রুদের শিবিরে এই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে ও আন্দোলনে কিভাবে জনতার শিবিরকে জয়ী করবেন তার পন্থা উদ্ভাবন করবেন। তিনি ইনকিলাব কাগজ বা তার মালিকদের সমর্থনের লোভে নিজেদের নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যদি বিষধর সাপকে আবার গলায় ঝোলান, তাহলে সাময়িকভাবে আবার ক্ষমতায় হয়তো যাবেন, কিন্তু দলের ও দেশের সর্বনাশ করবেন।

একথা চরমোনাইয়ের পীর ও মাইজভাণ্ডারীদের দিয়ে পাল্টা মৌলবাদী ফ্রন্ট গঠন এবং ক্ষমতার রাজনীতিতে তাদের ব্যবহার করার বেলাতেও সত্য। দেশে এদের প্রভাব কতোটা এবং এদের সমর্থক ভোটদাতার সংখ্যা কতো পার্সেন্ট তাও আওয়ামী লীগকে ভেবে দেখতে হবে। এদের সামান্য ভোটের লোভে আওয়ামী লীগ যেন তার সেক্যুলার ও গণতন্ত্রমনা ট্রাডিশনাল ভোটদাতাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে না হারায়। মৌলবাদী জামায়াতের বিরুদ্ধে আরেকটি মৌলবাদী ফ্রন্টকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নিজেই যেন এক মৌলবাদীদের ঠেকাতে গিয়ে আরেক মৌলবাদীদের খপ্পরে না পড়ে। তাহলে ক্ষমতায় গিয়েও আওয়ামী লীগের অবস্থা হবে বিএনপির মতো। ক্ষমতার লোভে জামায়াতকে কোলে আশ্রয় দিতে গিয়ে বিএনপিই এখন জামায়াতের আশ্রিত। ছুঁচো গিলতে গিয়ে ইঁদুরই এখন ছুঁচোর পেটে।

আওয়ামী লীগ যদি ক্রমশ সেক্যুলারিজম থেকে সরে যায়, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের প্রতি তাদের তোয়াজের নীতি এবং এপীজমেন্ট পলিসি অব্যাহত থাকে, তাহলে তা দেশের জন্য এক সর্বনাশা পরিণতি ডেকে আনবে। এ সম্পর্কে চৌদ্দ দলের নেতাদের বিশেষ করে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন এবং জাসদ (ইনু) নেতা হাসানুল হক ইনু ও অন্যান্য প্রগতিশীল সেক্যুলারমনা নেতাদের সজাগ হওয়ার এবং আওয়ামী লীগের উপর কার্যকর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানাই, নইলে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে সিপিএমসহ বামফ্রন্টের দলগুলো এখন যে দোটানা পরিস্থিতিতে পড়েছে, বাংলাদেশেও বাম দলগুলো সেই একই পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। এমনও হতে পারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতারা তাদের যেসব আপত্তি জানিয়েছেন এবং আমরা যার তীব্র সমালোচনা করেছি, তা শেষ পর্যন্ত ট্রাজিকালি সত্য হয়ে যাবে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান।

লন্ডন, ২ মে মঙ্গলবার ॥ ২০০৬
[লেখক প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট]

মামুন-অর-রশিদ

দুর্নীতির বৃত্তে বন্দী বাংলাদেশ

দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে দেশজুড়ে আর্থিক বৈষম্যের অনতিক্রম্য বৃত্ত তৈরি হয়েছে। ক্রমেই প্রকট হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের সীমারেখা। ধনী কালো টাকার পাহাড় গড়ছে, গরিব কোনমতে বেঁচে থাকার নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, মঙ্গা–দেশের অতি সাধারণ চিত্র। বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র মর্মবেদনা–এমন দেশ কি আমরা চেয়েছিলাম। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে কেনা বাংলাদেশ এখন জঙ্গীদের থাবায় আক্রান্ত, কালো টাকার মালিকদের কাছে জিম্মি, দুর্নীতিতে পর পর বিশ্বসেরা আর কপালে অকার্যকর রাষ্ট্রের তিলক। ড. রেজা কিবরিয়া জনকণ্ঠকে বলেছেন, আজকের এই দুরবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। তিনি আরও বলেছেন, সমাজে এখন নীতি নিয়ে বাস করাই কষ্ট। আমরা অন্যায় দেখলে এখন আর প্রতিবাদ করি না। আমাদের এসব এখন গা-সহা হয়ে গেছে। আমরা সকল প্রকার অন্যায়-অনিয়মকে হয় মেনে নেই না হয় মানিয়ে নেই।

অধ্যাপক আবুল বারকাত জনকণ্ঠকে বলেছেন, বৈষম্যমূলক দুই অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে অর্জন করা হয়েছিল স্বাধীনতা। মানুষের স্বপ্ন ছিল জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্র, রাজনীতিবিদদের ভাষায় সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। প্রত্যাশা ছিল অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদির উন্মেষ ঘটবে, মিলবে রাজনৈতিক মুক্তি, নিশ্চিত হবে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক জীবনে অন্তহীন লোভ-লালসা, ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার দুর্নীতির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এদেশে বিচারপতিরা শপথ পড়িয়ে সামরিক শাসনের বৈধতা দিয়েছে। পরিকল্পিতভাবে নীতিনৈতিকতাকে পাঠানো হয়েছে নির্বাসনে। মানুষ তার ন্যায্য অধিকার পেতে নিরুপায় হয়ে দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করছে। আজ কোথায় দুর্নীতি-অনিয়ম নেই? সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, কারা অভ্যন্তরে মাদক ব্যবসা, পরীক্ষার ফল জালিয়াতি, ভোট কেনা-বেচা, ভোট গণনা নিয়ন্ত্রণ, আইনের সাহায্য লাভ– সর্বত্র এখন দুর্নীতির সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন। তিনি বলেন, আমরা দুর্নীতির সাগরে ভাসছি, মুক্তির সহজ কোন পথ এখনও অনাবিষ্কৃত।

স্বাধীনতাউত্তর ৩০ বছরে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানা কুক্ষিগত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গুলি ইশারায়। রাষ্ট্রীয় পারমিট অবৈধ ভোগ, কমিশন বাণিজ্য, মূলধনবিহীন দালালি ব্যবসা তৈরি করেছে একটি বিশেষ শ্রেণী। সংঘবদ্ধ এই গোষ্ঠী নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে ক্ষুধা দারিদ্র্যের সঙ্গে মানসিক দৈন্যতা ও আঘাত হানছে সমাজ রাষ্ট্রকে। এ জন্য অনাহারে মানুষের মৃত্যুও সমাজ রাষ্ট্রকে স্পর্শ করছে না। অতি সম্প্রতি মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক গবেষণাপত্রে বাংলাদেশের সমাজচিত্রের বাস্তবভিত্তিক এই দৃশ্য তুলে ধরা হয়। বিষয়টি নিয়ে জনকণ্ঠের পক্ষে কথা বলেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মূলত '৭৫-এর পর নীতিনৈতিকতাহীন যে রাজনীতির সামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে পুনর্বাসন ঘটেছে সেখানেই রাজনীতি সমাজ আর রাষ্ট্র দুর্বৃত্তের চক্রে বন্দী হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, গত ৩৪ বছরে দেশের মোট ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে শিক্ষা, কমেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। গড় আয়ু যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি হ্রাস পেয়েছে শিশুমৃত্যুর হার। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (মাইক্রোক্রেডিট) বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে ঘটেছে ইতিবাচক অগ্রগতি। রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এগুলোর কোনটিই কার্যত অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রবণতার সূচক নয়। ড. আতিউর আরও বলেন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বৈষম্যের পাহাড় গড়া হয়েছে স্বাধীনতার মূল চেতনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। তিনি আরও বলেন, গ্রামের মানুষ বাজেটের ৮০ ভাগ যোগান দেয় আর শহরের মানুষ, বিশেষ করে বিত্তবানরা দেয় মাত্র ২০ ভাগ। গ্রামের উন্নয়নের দুরবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে সারাদেশের মানুষ ব্যাংকে যে ডিপোজিট রেখেছিল তা ছিল দেশের সে বছরের মোট ডিপোজিটের শতকরা ২৩ ভাগ। সরকারী হিসাবে ২০০৪ সালে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ দশমিক ৬ ভাগ। অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয় প্রায় সাড়ে সাত ভাগ কমেছে। আবার ১৯৯৬ সালে গ্রামের মানুষ ঋণ পেত ১৯ দশমিক ৭ ভাগ। ২০০৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৭ ভাগ। ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন বা আছেন তাঁদের সকলের বক্তব্য উন্নয়ন ঘিরে। কথিত উন্নয়নের জোয়ার কিংবা ক্ষমতায় থাকার সময় 'ইমাজিং টাইগারসহ' নানারকম চিত্তাকর্ষক শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এই উন্নয়ন হয়েছে গুটিকয়েক ক্ষমতাধরের। ড. আতিউর রহমান বলেন, উন্নয়ন মানে কিছু রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট বা অবকাঠামো তৈরি নয়। এর সঙ্গে জড়িত মানুষের পছন্দ, অধিকার, নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রা। কিন্তু অর্বাচীন পতিত সামরিক সরকারের

মতো সব সরকারই উন্নয়ন নিয়ে প্রতারণা করে, গল্প পাতে-ফাঁদে। তাঁদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতাউত্তর দেশের অর্থনীতিতে এমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে এখনও গোটা জাতিকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে লাগবে ৩১০ বছর, আর গ্রামীণ দরিদ্র বিমোচনে লাগবে ৯০৯ বছর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভেতর আর যাই থাক, গ্রামীণ দরিদ্র বিমোচনে নয় শ' বছর লাগার কথা ছিল না। তিনি বলেন, গত ৩৪ বছরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বড়মাপের এমন কোন গলদ ছিল যা এদেশের মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে দেয়নি। আর এই গলদ হচ্ছে মানবকল্যাণ বিমুখ কাঠামোগত রূপান্তর। রাজনীতির মর্মার্থ মানবকল্যাণ হলেও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে গণবিরোধী।

বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। সম্পদের মালিকানা হস্তগত করছে একটি বিশেষ শ্রেণী। এই প্রক্রিয়ায় ধনী আরও ধনী, মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র হচ্ছে হতদরিদ্র। এ কারণে অনাহার-অর্ধাহার, ক্ষুধা-মঙ্গা আঘাত হানছে জনজীবনে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেছেন, 'দেশের উত্তরাঞ্চলে ভূমির মালিকানা বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত। সাধারণ মানুষকে স্থায়ীভাবে মফিজ বানিয়ে রাখা হয়েছে।' অধ্যাপক বারকাত আরও বলেন, 'কেউ অট্টালিকায় আর কেউ বটতলায় থাকলে পরিস্থিতি যা হবার তাই হচ্ছে। শাসকশ্রেণীর আটতলায় অবস্থান, বটতলার মানুষের দিকে তাকানোর ফুসরতটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। লুটেরমাল তারা ভোটের আগে ঢালবে, কিন্তু এখন অনাহারী মানুষের জন্য তাদের যেন করার কিছুই নেই(!)।

(চলবে)